দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 31 JAN 1993
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১ ...

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কোন পথে?

ডক্টর মুহম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক

পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে ১৯৮০-এর দিকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে গৃহীত ও কার্যকরী সিদ্ধান্ত এ দেশে ইসলামী উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের পথ সুগম করে এবং নিসন্দেহে একটি নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে। বস্তুত মুসলিম উম্মাহর অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল শিক্ষা অন্বেষণকে কেন্দ্র করে এবং পাথেয় স্বরূপ গ্রহণ করে- যা বিশেষভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে কালামে পাকের প্রথম আয়াতে ঃ "পড়ো তোমরা প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন"। আর সত্যি বলতে কি একটি সমৃদ্ধশালী, সুন্দর ও সার্থক দেশ এবং সেই দেশে সমাজ ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটতে পারে কেবল একটি কল্যাণময় শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেই।

উন্নতি, সমৃদ্ধি ও সফলতার এ গূঢ় রহস্যটি মুসলিম জাতি উপলব্ধি করেছিল তার সূচনা লগ্নেই। আর সেই উপলব্ধির প্রতিফলন ঘটেছিল মুসলিম বিশ্বে মাদ্রাসা নামক শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক জনপ্রিয়তার মাধ্যমে। প্রাথমিক যুগের মাদ্রাসাসমূহ যেমন মাদ্রাসা মুসতানসারিয়াহ, মাদ্রাসা নিজামিয়াহ, আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, কায়রাওয়ান বিশ্ববিদ্যালয়, ফাস বিশ্ববিদ্যালয় ও কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় মান-মর্যাদার দিক থেকে কোন অংশেই বর্তমানের হার্ভার্ড, অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হতে কম ছিল না। এ সকল শিক্ষাঙ্গনই জন্ম দিয়েছিল জাবের বিন হাইয়ান, ইবনে সীনা, আল বিরুনী, আল গাজ্জালী, আল ইদরিসী প্রমুখ ক্ষণজন্মা, বিদগ্ধ মনীষীদের।

মুসলিম বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ও শিক্ষার ঐতিহ্যবাহী ধারার দিগন্ত প্রসারী প্রভাব বাংলার মাটিতে পৌঁছতে বেশী সময় লাগেনি। এ দেশে মুসলিম শাসনের সূচনার সাথে সাথে গড়ে উঠতে শুরু করে অসংখ্য-অগণিত মাদ্রাসা ও অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। জ্ঞান আহরণ এবং তা বিতরণের এ গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য এদেশে বৃটিশ উপনিবেশিকতা শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। উপনিবেশিক শাসনামলে এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর এক বিরাট অংশ বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলন পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। খুব স্বাভাবিক কারণেই এগুলো উপনিবেশিক শাসকদের কোপানলে পড়ে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ বহু মাদ্রাসা, ওয়াকফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় এবং বৃটিশ বিরোধী শিক্ষক ও পণ্ডিতবর্গ তথা উলামাদের ব্যাপকভাবে উত্যক্ত করা হয়। উল্লেখ্য যে, ইংরেজদের [illegible] শিক্ষক [illegible] গোড়া পর্যন্ত সরকারী ভাষা ফার্সীই থেকে যায়। এমনকি এ দেশে মুসলমানদের সংগে লেনদেন তথা গণসংযোগের উদ্দেশ্যে উপনিবেশ সরকার কলিকাতায় একটি মাদ্রাসাও স্থাপন করেন।

যাহোক, ১৮৩৫ সালে লর্ড মেকলের সুপারিশক্রমে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক এক নতুন শিক্ষানীতি গ্রহণ করেন, যেখানে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য রীতিতে শিক্ষা দানের পদ্ধতি গৃহীত হয়। এ শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল নেটিভদের (দেশীয় জনসাধারণের) মধ্য থেকে কেরানী জাতীয় এমন এক শ্রেণী তৈরী করা, যারা নাকি H. Sharp-এর ভাষায় "রক্তে ও বর্ণে ভারতীয়; কিন্তু রুচিতে, ভাবধারায়, নীতিতে ও বুদ্ধিতে ইংরেজ"। এভাবে উপনিবেশিক কায়েমী স্বার্থের উদ্দেশ্যে ইংরেজরা গড়ে তুলতে শুরু করলো স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এমন এক শ্রেণীর আমলাতন্ত্র গড়ে তোলা যারা কেবল বৃটিশ স্বার্থ রক্ষা করবে। কতকটা এভাবেই উপনিবেশিক স্বার্থ রক্ষার্থেই এদেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে উঠে।

দুর্ভাগ্যবশত ঃ স্বাধীনা-উত্তর যুগে সরকারী পৃষ্ঠ-পোষকতায় যে সব স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটিসমূহ জন্ম নেয়, তা মূলত উপনিবেশ ধাঁচেই গড়ে উঠে। আমাদের নিজস্ব আদর্শ, মূল্যবোধ ও চাহিদা পূরণের কথা তো দূরে থাক, এমনকি খোদ বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের বা পাশ্চাত্যের অন্যান্য ইউনিভার্সিটিগুলোর মানদণ্ডের সংগেও বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সামঞ্জস্য রাখতে বহুলাংশে ব্যর্থ হয়েছে। এ ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম হলো ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়- যার জন্ম হয় জনগণের দাবীর (Popular demand) ওপর ভিত্তি করে এবং যার Root বা শিকড় পুরোপুরি সম্পৃক্ত ছিল প্রাক উপনিবেশ যুগের বাংলার শিক্ষা-দীক্ষার ঐতিহ্যের সংগে। বৃটিশ-পূর্ব যুগের সেই সব দেশীয় শিক্ষা কেন্দ্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে এবং মাদ্রাসা, মক্তব, দারসবাড়ী ইত্যাদি বিভিন্ন নামে সেগুলো পরিচিত ছিল।

এখানে উল্লেখ্য যে, বর্তমান বিশ্বে বাংলা ভাষা-ভাষীরা সংখ্যাগরিষ্ঠভাবে মুসলমান এবং ইসলাম বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে এমনভাবে মিশে গেছে যে, ইসলামকে বাদ দিয়ে বাঙ্গালী ঐতিহ্যের কথা মোটেই কল্পনা করা যায় না; ঠিক যেমন চিন্তা করা যায় না পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি খৃষ্টীয় ঐতিহ্য ব্যতীত- তারা যতই ধর্মনিরপেক্ষতা বা Secularism বলে মিথ্যা চেঁচামেচি করুক [illegible] সুতরাং খাঁটি বাঙ্গালী [illegible] যেমন [illegible] জানতে হবে, তেমনিভাবে এ দেশে সত্যিকারের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখতে হলে আমাদের একান্তই প্রয়োজন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের, যা সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা ভাষাভাষীদের ধর্মীয় চেতনা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি মূল্যবোধ অধ্যয়নের ও গবেষণার এক যথাযোগ্য প্লাটফর্ম বা মঞ্চ সরবরাহ করবে।

ইতিহাস

একথা অনস্বীকার্য যে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবাদি পেশ হওয়ার প্রারম্ভেই ১৯১২ সালের ৪ঠা এপ্রিলে এক পত্রে ভারত সরকার মুসলিম জনগণের দাবীর মুখে এই মর্মে আশ্বাস দেয় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবিচ্ছেদ্য অংগরূপে একটি ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ গঠন করা হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্নে 'নাথান কমিটি' ইসলামিক স্টাডিজকে একটি স্বতন্ত্র অনুষদ করার স্থলে একে কলা অনুষদেরই অধীনে একটি বিভাগে পরিণত করে। ১৯১৪ সালের এপ্রিলে মোহামেডান এডুকেশন এডভাইজারী কমিটি ঢাকায় এক সম্মেলনে ইসলামী বিশ্বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবসহ ১৯৭টি সুপারিশ পেশ করে। ১৯৩৭ সালে অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আগমন করলে ছাত্ররা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবীতে এক স্মারকলিপি পেশ করে। প্রায় সমসাময়িককালে জনাব মাওলা বকসের নেতৃত্বাধীনে গঠিত মাদ্রাসা শিক্ষা কমিটি (১৯৩৮-৪১) তাদের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হিসাবে কলিকাতায় একটি ইসলামী শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয় (University of Islamic Learnings) স্থাপন করার প্রস্তাব করেন। বাংলার তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা ফজলুল হক প্রস্তাবটি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে সেটি আর বাস্তবে রূপ নিতে সক্ষম হয়নি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলার একজন প্রখ্যাত মুসলিম চিন্তাবিদ মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০) দীর্ঘকাল যাবত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ধ্যান-ধারণার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। অতঃপর স্বীয় প্রচেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে ধীরে ধীরে এ দাবীটিকে জনপ্রিয় করে তুলেন।

চলবে